'অন্নদামঙ্গল' কাব্যকে কবি ভারতচন্দ্র 'নূতন মঙ্গল' নামে অভিহিত করেছেন। নূতন মঙ্গল বলার যুক্তিযুক্ততা কতখানি তা আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।

কবিগুরুর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ধারাবাহিক 'মঙ্গল কাব্যের' যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য, এই ধারায় প্রাচীন মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল এবং ধর্মমঙ্গল কাব্য পাওয়া গিয়েছে, এছাড়াও কবি একেক ধারার মঙ্গলকাব্য রচনা করেছেন, এই সব কবিদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত, মুকুন্দ চক্রবর্তী, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ এবং ঘনরাম চক্রবর্তী, ভারতচন্দ্র যে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য লিখেছেন তাও 'মঙ্গল' নামেই চিহ্নিত, অথচ তিনি তাঁর কাব্যকে 'নূতন মঙ্গল' বলেছেন, স্বভাবতই মনে হতে পারে এই কাব্যটিকে নূতন মঙ্গল বলার যুক্তিযুক্ততা কতখানি,

মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত কাব্যধারার একটি কাঠামো বৈশিষ্ট্য আছে, সমালোচকেরা লক্ষ করেছেন সেইসব মঙ্গলকাব্যে এমনসব দেব-দেবী দেব নিয়ে লেখা যারা লোকায়ত (লৌকিক) হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের আর্যীকরণ ঘটেছে, দ্বিতীয়ত, সেইসব মঙ্গলকাব্যে আখ্যানভাগ বিশেষ কাঠামোর বৈশিষ্ট্য আছে, সেগুলির মধ্যে বন্দনা খণ্ড, দেবখণ্ড, এবং নরখণ্ড এই তিনটি ভাগ প্রধান স্থান পায়, তাছাড়া আখ্যানভাগে আলাদা আলাদা যেখানে কবি তাঁর কাব্য রচনার কারণ বিবৃত করে থাকেন, আখ্যানে বিশেষ মঙ্গলকাব্যে দেব-দেবী সম্পর্কিত কাহিনী থাকে, দেবতা বা দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করাই এই জাতীয় মঙ্গল কাব্যের লক্ষ্য, শুধু তাই নয় লোকজীবন সম্পৃক্ত যেকোনো এই জাতীয় কাব্য রচনার পেছনে সক্রিয় থাকে, এই মঙ্গল কাব্যগুলি প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত, দেবতা বা দেবীর নির্দেশেই সেখানে কাব্যগুলো বিবৃত হয়ে থাকে,

কিন্তু অন্নদামঙ্গল কাব্যের কবি যেভাবে তাঁর কাব্য রচনা করেছেন তাতে দেখা যায় গ্রন্থ-উৎপত্তির কারণ সম্পর্কে বলেছেন "নূতন মঙ্গল আলো ভারত সরস হোক"

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আনুগত্যে

অর্থাৎ ভারতচন্দ্র রাজার আদেশেই তাঁর কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, তাছাড়া ভারতচন্দ্র প্রাচীন লোকায়ত মানসিকতার পরিবর্তে তাঁর কাব্যের মধ্যে পরিশুদ্ধ ভাব তোলেননি, অন্নদামঙ্গল হয়ে উঠেছে নাগরিক জীবনের কাব্য, নাগরিক মনন সমৃদ্ধ প্রজ্ঞান জাগরণ লক্ষ্যণীয় এখানে নানাদিকে নানাভাবে পরিশুদ্ধ হয়ে উঠেছে, হয়ত আগেকার কাব্যেও বন্দনা অংশ আছে, আত্মপরিচয়ের অংশ আছে, দেবখণ্ড এবং নরখণ্ডও আছে, কিন্তু এইসব বিষয় পরিবেশন করতে গিয়ে

"নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়
বিজুর দীপিচ লোক বেচে শেল দায়"

বাণিজ্য আগমন, বাংলা লুণ্ঠন প্রভৃতি মধ্যযুগের ঐতিহাসিক তথ্য কবি তাঁর কাব্যে উপস্থাপিত করেছেন। বারোমাসীর মধ্যযুগীয় ভক্তিভাবের প্রবলতা নয়, কবির জীবন সম্পর্কিত চেতনায় অন্নদামঙ্গল কাব্যের মধ্যযুগের প্রকাশ পেয়েছে।

সবশেষে বলা যায় কবির মধ্যযুগের জনজীবনের কাব্যটিকে পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন দেবদেবী, অলৌকিকতার চাতুর্যে, কাব্য প্রয়োগে কবির ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। বস্তুত তিনি মঙ্গলকাব্য রচনার অন্তিম পর্বে, কিন্তু সেই অন্তিম লগ্নেরই এমনভাবে অন্নদামঙ্গল রচনা করেছেন যাতে মনে হয়, এমন সূর্যনিষ্ঠ্যুতিময় আলোর বিচিত্র বর্ণের লোকো, রবীন্দ্রনাথও তাই বলেছেন, ভারতচন্দ্রের কাব্য রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো, যেমন তার উজ্জ্বলতা, তেমনি তার ভারবোধ। অধ্যাপক ভট্টাচার্য লিখেছেন, "প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রত্যন্তপ্রান্তে কবিদের অপর প্রান্তে ভারতচন্দ্র সূর্যকরোজ্জ্বল দুপারে শৈলের দুই সমুন্নত সর্ন শৃঙ্গ — একত্র দিগন্তাচলে অপরাহ্ন অস্তাচলে নিবদ্ধ।"

জায়গায় জায়গায় ভারতচন্দ্র আদর্শ রসের ব্যতিক্রমও করেছেন। তিনি হর-গৌরীর প্রসঙ্গে উপাখ্যান জুড়ে বর্ণিত করেছেন যাতে হরগৌরীর দেবত্বের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটেছে, বিচ্ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়েছে, বিবাহ সভায় শিবের ব্যবহার আচরণ ও শিবকে হাস্যাস্পদ করে তুলেছে, কেননা দেবতার কোনও কামগন্ধই দেখতে গেলে কামই এসেছে এবং উলঙ্গ হয়ে পড়েছে। মহুই তপস্বিনী এই শিবকে নিয়ে সকলে হাসি-তামাসাও করেছে।

কেহ বলে এ এলো শিব বুড়াবাঁড়
কেহ বলে বুড়াটি খেয়াও দেখি ঘাড়
কেহ বলে ভূতা হইতে মরণের ভয়
কেহ বলে ছাগলে দেখি ছাগলে অনল

মুকুন্দ চক্রবর্তী হর-গৌরীর দাম্পত্য জীবনের বাস্তবতাকে আঁকলেও শিবকে নিয়ে এই ধরনের হাসি-তামাসা করেননি। শুধু তাইনয়, গৌরীর সঙ্গে লড়াই কন্দলও এসেছে সমস্ত দেবীত্বের রূপ ধুয়ে মুছে গেছে।

বোঝাযায় ভারতচন্দ্র তাঁর নিজের যুগের প্রভাবে পূর্ববর্তী মঙ্গলকাব্যের কবিদের মত ভক্তিভাব প্রকাশ করতে পারেন নি, বরং আধুনিক মননের অধিকারী হয়েছেন। কবির এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির মানসিকতার জন্যেই পুরানে বর্ণিত ব্যাসদেবের চরিত্র নিয়েও হাস্য পরিহাস করা সম্ভব হয়েছে। ব্যাস-কাহিনী প্রসঙ্গেই এই বিষয়ের উল্লেখ করে ভারতচন্দ্র ধর্মের প্রতি অবিশ্বাস জনিত মনোভাবের জন্যই সমস্ত কাব্যজুড়ে হাস্যরস ও রঙ্গ-ব্যঙ্গ সৃষ্টি করে গেছেন।

আরও লক্ষ করার ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্য এই প্রথম খণ্ডটি ছাড়া আরও দুটি খণ্ডে বিভক্ত হয়েছে, তার এক খণ্ডের মধ্যে রয়েছে আদিরসাত্মক বিদ্যাসুন্দর। ভারতচন্দ্র ইতিহাস থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন, তাঁর গ্রন্থের পাত্র-পাত্রী অন্নদার মধ্যেও ইতিহাসের কথা আছে। সর্বত্রই যে তিনি ইতিহাসের তথ্য অবিকৃত ভাবে অনুসরণ করেছেন তা নয়, কিন্তু ইতিহাসের নানা প্রসঙ্গ তুলে তাঁর কাব্যটিকে তিনি মহনীয় রূপ দান করেছেন। লক্ষ করার ইতিহাস কথার প্রসঙ্গে কবি দেখিয়েছেন বিজয়ার দেশের মধ্যে অরাজকতা সৃষ্টি হয়ে ভিন্ন রাজ্যের নানা স্থান অগ্নিদগ্ধ হয়ে মরুভূমে পরিণত যে অগ্নিদগ্ধ হয়ে পড়ে এই সময়ে কবির কাছে স্বপ্নে চিত্র